নয়া দিগন্ত

ঢাকা, রোববার, ২৪ ফাল্গুন ১৪১৫, ৮ মার্চ ২০০৯

আইনের দুর্বলতার কারণে সৃষ্ট দুর্নীতি

ড. এম আজিজুর রহমান

জীবন চলার পথের নির্দেশিকা হিসেবে যেসব উপকরণ ও উপাদানের প্রয়োজন হয় তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো তথা আইন। আইন তথা সংশ্লিষ্ট রীতিনীতির সুষ্ঠু চর্চা থাকলে একটি সমাজ ইতিবাচকভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক। আইন যথাযথভাবে মেনে না চললে শাস্তির ব্যবস্থা থাকে। উদার ও উৎপাদনমুখী আইন দেশের উন্নয়নের চাকা সচল রাখে। অপর দিকে আইনের ত্রুটি ও দুর্বলতা অনেক সময় মানুষকে আইনবিমুখ করে তোলে। আইন মানতে গিয়েই যেন মানুষ নানা রকম ভোগান্তির শিকার হয়। এ অবস্থা 'সরিষার ভেতরে ভূত' আমাদের দেশের চিরাচরিত এ প্রবাদকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্রিটিশ আইনের অধীনে পরিচালিত বাংলাদেশের প্রচলিত অনেক আইনে সরিষার ভেতরে ভূতের নজির রয়েছে। তাই এ ধরনের আইনের সংস্কার করে উদার ও উৎপাদনমুখী আইন প্রণয়ন করা জরুরি।

বিশ্বের উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ব্রিটিশ আইনের অধীনে পরিচালিত দেশগুলো উন্নতির উচ্চশিখরে আসীন হতে পারেনি। এমনকি স্বয়ং যুক্তরাজ্য উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। যুক্তরাজ্যের মানুষকে জীবনযাত্রার মান ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার জন্য যে খরচ করতে হয় সে তুলনায় মানুষের মাথাপিছু আয় যথেষ্ট নয়। নর্থ আমেরিকা বা সমসাময়িক দেশগুলোর তুলনায় যুক্তরাজ্যের মানুষের আয়, বেতন-ভাতাদি খুব কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যুক্তরাজ্যের বেশিরভাগ নামী-দামি প্রফেসরকে অতিরিক্ত আয় ও গ্রীষ্মকালীন চাকরির জন্য আমেরিকায় যেতে হয়। অন্যথায় তাদের জীবিকা নির্বাহ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। একই সাথে এক সময়ে যুক্তরাজ্যের সাম্রাজ্যভুক্ত এশিয়া মহাদেশের কিছু দেশ এখনো ব্রিটিশ আইনের অধীনে পরিচালিত হওয়ায় তাদের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা সুখকর নয়। অপর দিকে যেসব দেশ ব্রিটিশ আইনের আওতায় পরিচালিত নয় অথবা যেসব দেশ ব্রিটিশ আইন পরিবর্তন করে নিজস্ব আইন তৈরির মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করে, তাদের অনেক দেশই উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে পেরেছে। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ফ্রান্স ও জার্মানির কথা বলা যায়। এসব দেশে দারিদ্র্য নেই, বিচার বিভাগের দুর্বলতা নেই এবং সামগ্রিকভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেক উন্নত। মানসম্পন্ন শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, কর্মসংস্থান, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পায়নে উল্লিখিত দেশগুলো অনেক উঁচুতে উঠতে সক্ষম হয়েছে। আয়-উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি বাড়ার কারণে দেশগুলোতে দুর্নীতি নেই বললেই চলে। তাই বলা যায়, উন্নত দেশগুলোর আইন ও এর ধারা-উপধারা অত্যন্ত গঠনমূলক ও উৎপাদনশীল। তাই দেশ গঠনে এসব আইন ফলপ্রসূ অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। অপর দিকে ব্রিটিশ আইন ও এর ধারা-উপধারা যথেষ্ট প্রয়োগযোগ্য ও ফলপ্রসূ না হওয়ায় ব্রিটিশ আইনের অধীনে পরিচালিত দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে তেমন একটা অগ্রসর হতে পারেনি।

আমরা জানি, আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে নিয়ম বহির্ভূতভাবে অন্যের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল করা, অবৈধভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্যে সুযোগ দেয়া বা নেয়া, কর্মসংস্থান ও চাকরির সুযোগ দেয়া বা নেয়া– এসব কিছুকেই দুর্নীতি বলে। গরিব দেশগুলোতে দুর্নীতি বেশি দেখা যায়। অভাব-অনটন ও জঠরের জ্বালা দূর করতে কেউবা দুর্নীতি করে, আবার কেউ বর্তমান অবস্থার চেয়ে আরো বেশি ভালো থাকার জন্য দুর্নীতি করে। সুশিক্ষার অভাব, নৈতিক চরিত্রের অধঃপতনের কারণেই মানুষ দুর্নীতিকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। এ ছাড়াও আইনের অপপ্রয়োগযোগ্য ধারা-উপধারা ও আইনের দলিল তৈরিকারী আমলাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাব দুর্নীতির কারণ কি না, তাও ভেবে দেখার বিষয়। উদাহরণস্বরূপ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২-এর উল্লেখ করা যায়। এ আইনে বলা আছে, কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের মধ্যে নিজস্ব ১৫ বিঘা জমিতে ক্যাম্পাস স্থানান্তর করবে। বাংলাদেশের অর্ধশতাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগই ঢাকা শহরে অবস্থিত। ঢাকা শহর বা এর আশপাশে এক সাথে ১৫ বিঘা আয়তনের জমি পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। আর যদি তা না পাওয়া যায় তবে এত বিশ্ববিদ্যালয়কে ঢাকা শহরে শিক্ষাকার্যক্রম চালানোর অনুমতি কেন দেয়া হলো? স্বাভাবিকভাবেই এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সদিচ্ছা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজস্ব জমিতে ক্যাম্পাস স্থানান্তর করতে পারছে না এবং সরকারের চোখের সামনে ভাড়া করা বাড়িতেই কার্যক্রম চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তাহলে এ অবস্থায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপকে কি দুর্নীতির আওতাভুক্ত করা হবে? আর যদি দুর্নীতির আওতাভুক্ত করা হয় তবে এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে কি আইনের দুর্বলতায় তথা সরিষার মধ্যে ভূত বেরিয়ে আসবে না? এ অবস্থায় মানুষ কিভাবে আইন মেনে চলবে এটিও ভেবে দেখার বিষয়।

দেশের আপামর জনসাধারণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সব রকমের দ্রব্যসামগ্রী জোগান দিয়ে থাকে দেশের কৃষককুল, মৎস্যজীবী ও বিভিন্ন ধরনের শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাথে জড়িত ব্যক্তিগোষ্ঠী। সরকারি ও বেসরকারি চাকরিজীবীদের বেতন-ভাতাদিও ওই সব কৃষক, মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত কর থেকে আসে। প্রায়ই সমালোচনা শোনা যায়, ব্যবসায়ীদের অনেকেই দুর্নীতির সাথে জড়িত। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে ব্যবসায়ীদের অনেক কর্মকাণ্ডই দুর্নীতি হিসেবে অভিহিত হয়। আইনের ভেতর এমন কিছু ধারা-উপধারা আছে যা ব্যবসায়বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। তাই দুর্বল আইনের ধারা না মানায় ব্যবসায়ীদের কর্মকাণ্ড দুর্নীতি হিসেবে শনাক্ত করা হয়। মনে রাখতে হবে, মানুষের জন্য আইন, আইনের জন্য মানুষ নয়। তাই দেশের আপামর জনসাধারণের রিজিক দান করার মহৎ দায়িত্ব পালন করছে যে ব্যবসায়ী শ্রেণী, দুর্বল আইনের ফাঁদে তাদের বন্দী করে তাদের কর্মকাণ্ডকে দুর্নীতি হিসেবে অভিহিত করা সমীচীন কি না তা ভেবে দেখতে হবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে আইনের ধারা-উপধারায় সংস্কার এনে তাদের কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাথে জড়িত নয় এমন ব্যক্তিবর্গ নিয়ে ব্যবসায়সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হলে তা সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগযোগ্য বা দেশের উৎপাদনশীল নাও হতে পারে। আইন বিশেষজ্ঞরা আইন তৈরির কাঠামো, অপরাধের ধরন, কোন ধরনের অপরাধের জন্য কী পরিমাণ শাস্তি দেয়া যেতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে ভালো জানেন। কিন্তু ব্যবসায়সংক্রান্ত আইনের আওতায় কী ধরনের কাজকর্ম ও ব্যবসায়-বাণিজ্য অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত তার জন্য ব্যবসায় ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকের অংশগ্রহণ ও মতামত প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ট্রুথ কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্যবসায়বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা। ট্রুথ কমিশনের মূলনীতি হচ্ছে একদিকে যেমন দুর্নীতিতে ব্যবসায়ীদের জড়িত হওয়ার সুযোগ দেয়া যাবে না, অন্য দিকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অন্তরায় সৃষ্টি করে দেশকে বিপর্যয়ের মুখে ফেলে দেয়া যাবে না। ট্রুথ কমিশন ফলপ্রসূভাবে প্রয়োগযোগ্য আইন তৈরি করতে চায়। অবশ্যই এ কমিশনে আইন বিশেষজ্ঞদের সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি থাকতে হবে। যদি তা না রাখা সম্ভব হয় তবে এ আইনের দ্বারা ব্যবসায়বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির সম্ভাবনা ক্ষীণ হিসেবে দেখা দেবে। ওপরের আলোচনা থেকে অনুমান করা যায়, ব্রিটিশ আইন ও এর ধারা-উপধারায় যথেষ্ট ত্রুটি ও দুর্বলতা থাকায় এসব আইন অনুসরণকারী দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে পিছিয়ে আছে। ব্রিটিশ আইনের আওতাভুক্ত দেশগুলো সামন্তবাদ ও অনুৎপাদনশীল রীতিনীতির বেড়াজাল অতিক্রম করতে পারছে না। এ অবস্থায় বাংলাদেশসহ সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সাধারণ মানুষ, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে জড়িত ব্যক্তিবর্গ নিরুপায় হয়ে অর্থনীতির চাকা চালু রাখতে গিয়ে কিছু কিছু দুর্নীতি করতে বাধ্য হচ্ছেন। যেমন, সার্কভুক্ত দেশগুলো দুর্নীতিগ্রস্ত হলেও বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও মালদ্বীপ ব্যবসায়-বাণিজ্যে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। আবার গণতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিকতার সংমিশ্রণে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক ভারত ব্যবসায়-বাণিজ্যে সার্ক দেশগুলোর মধ্যে তুলনামূলক সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়ে গেছে।

আইন প্রণয়ণের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুষ্ঠু জীবনযাপন পদ্ধতির সুনিশ্চিত করা। আইনে সুষ্ঠু অনুসরণ ও প্রয়োগে মানুষ নিরাপদ জীবনযাপন করবে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি হবে এবং দেশ কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের পথে ধাবিত হবে এটাই সবার প্রত্যাশা। কিন্তু ব্রিটিশ আইন অনুসরণ করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত আমরা আইনের শৃঙ্খলে জড়িয়ে যাচ্ছি এবং দেশের উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। জটিল আইনের ঘূর্ণিপাকে জড়ানোর ভয়ে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে আইন বিমুখ হয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছে। সরিষাতে ভূত থাকলে ভূত কে তাড়াবে? আইনের মধ্যে দুর্বলতা ও জটিলতা থাকলে এ অবস্থা চলতে থাকবে। তাই দেশের সামগ্রিক ও কল্যাণের কথা বিবেচনা রেখে সরিষা থেকে ভূত তাড়ানো তথা উদার ও উৎপাদনমুখী আইন প্রণয়ন এখনো সবচেয়ে বেশি জরুরি। ■

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি